শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান আত্ তামিমি (রহিমাহুল্লাহ) রচিত

“ছয়টি মূলনীতি”র ব্যাখ্যা

হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান

প্রাক্তন শিক্ষক : মা’হাদ , মাসজিদে নববী

তত্ত্বাবধায়ক: মা’হাদুস্ সুন্নাহ

https://www.alsarhaan.com

আল্লাহ তায়ালা তাকে, তার পিতা-মাতাকে ও যারা এই কিতাব লিখতে সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন।

প্রথম সংস্করণ

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তবে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য মূদ্রণ ও অনুবাদ

লেখকের পুনর্মূল্যায়ন শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত

যোগাযোগ:

islamtorrent@gmail.com

সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে সাহায্য চাই, তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নাফসের অনিষ্ট এবং মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হেদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়াত দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:(হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।) {আলে ইমরান: ১০২}, (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্বওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ব দাবী করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।) {আন-নিসা:১} , (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো* তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে) {আহযাব: ৭০, ৭১}

অত:পর, নিশ্চয়ই শারীয়াতে বর্ণিত কায়েদা ও মূলনীতি সমূহ আয়ত্ব করা প্রত্যেক ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যক। আর এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি হচ্ছে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান আত্ তামীমী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত মূল্যবান গ্রন্থ "أصول الستة " বা "ছয়টি মূলনীতি"। আলেমগন এই পুস্তিকাটিকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পুস্তিকাটিতে লেখক এমন ছয়টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যেগুলি আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক খুবই স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়গুলিতে ভুল করে থাকে এবং পথভ্রষ্ঠ হয়। পুস্তিকাটি সহজ করনার্থে আমরা এটিকে "তালিকা পদ্ধতি"তে ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করেছি। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সামান্য কিছু সংযোজন করেছি।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই কাজকে একনিষ্টভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার তাওফীক দান করেন, এর মাধ্যমে লেখক ও পাঠককে কল্যান দান করেন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার বর্গ, সকল সাহাবা ও কিয়ামাত পর্যন্ত আগমনকারী তাদের সকল অনুসারীদের উপর। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্য।

কিতাবের ভূমিকা:

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার কুদরতকে নির্দেশকারী মহা নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই 'ছয়টি মূলনীতি', যা আল্লাহ তা'য়ালা সাধারন মানুষের জন্য কল্পনাতীত স্পষ্টভাবে বর্ননা করেছেন , অথচ খুবই সামান্য সংখ্যক ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরা এবং আদম সন্তানের সর্বোচ্চ বিদ্যানবর্গও এ ব্যপারে ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছে।

ছয়টি মূলনীতির সংক্ষিপ্তরূপ:

প্রথম মূলনীতি:
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত এবং এর বিপরীত বিষয়ের বর্ণনা, আর তা হচ্ছে শিরক।

দ্বিতীয় মূলনীতি:
দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকা, দলে দলে বিভক্ত না হওয়া।

তৃতীয় মূলনীতি:
শাসকের আনুগত্য করা, এর বিপরীত হচ্ছে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং অবাধ্য হওয়া।

চতুর্থ মূলনীতি:
ইলম ও আলেমগণ, ফিক্‌হ ও ফকিহগণের বর্ণনা, এবং যারা তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের বর্ণনা।

পঞ্চম মূলনীতি:
আল্লাহর ওলীগণের বর্ণনা, এর বিপরীত হচ্ছে শয়তানের ওলী।

ষষ্ঠ মূলনীতি:
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক পথের অনুসন্ধান করা, এর বিপরীত হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ ত্যাগ করা।

কেন আমরা 'ছয়টি মূলনীতি ' পড়বো ?

[১] এ ব্যাপারে আলেমগণের উপদেশের কারণে।

[২] ইসলামের মূলনীতি জানা, বিশ্বাস করা এবং আমল করার জন্য।

লেখক ‘বিস্‌মিল্লাহ’ দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন, আলেমগণ এই পদ্ধতি অনুসরন করেন, কারণ:

[১]কুরআনুল কারীম ও নবী-রসূলগণের অনুসরণে।

[২]{{**প্রত্যেক এমন কাজ যার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা অসম্পূর্ণ**}} হাদীস অনুসরণে। যদিও হাদীসটি দূর্বল।

[৩] সালাফগণের অনুসরণে।

[৪]আল্লাহ তা’য়ালার নাম দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

বিস্‌মিল্লাহ এর অর্থ?

[১](بسم) অর্থাৎ (আল্লাহর নাম নিয়ে লিখছি।) আল্লাহর নাম শুরুতে আনা হয়েছে বরকত লাভ ও সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য।

[২] (الله) এটি পরাক্রমশালী আল্লাহ তা’য়ালার নাম। তাঁর অন্যান্য সকল নাম এই নামেরই অনুসরণ করে।

[৩] (الرَّحمن) তিনি প্রশস্ত রহমতের গুনে গুনান্বিত, যে রহমত সমস্ত সৃষ্টিজগৎ কে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।

[৪] (الرَّحيم) এমন রহমতের গুণে গুণান্বিত যে রহমত তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

‘ছয়টি মূলনীতি’ দ্বারা লেখক কি সীমাবদ্ধতা বুঝিয়েছেন?

নিয়ম হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও আলেমগনের কথার মধ্যে যখন কোন সংখ্যা উল্লেখ থাকে এমতাবস্থায়:

[১] যদি ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অন্যস্থানে এর চেয়ে বেশি সংখ্যা উল্লেখ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ সংখ্যাটিই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তার চেয়ে বেশি বুঝাবেনা। যেমন: ইসলামের রুকন সমূহ, ঈমানের রুকন সমূহ; যেমনটি হাদীসে জিবরীলের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

[২] আর যদি ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অন্যস্থানে এর চেয়ে বেশি সংখ্যা উল্লেখ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কম সংখ্যাটি উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশি সংখ্যাটিই উদ্দেশ্য হবে । যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: {পাঁচটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত.....} , অন্যত্র তিনি বলেন:{তোমরা ছয়টি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকো.....}

কেন কখনো কখনো এমন সংখ্যা উল্লেখ করা হয় যা উদ্দেশ্য নয়?

এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা প্রদানের সুন্দর পদ্ধতি সমূহের মধ্যে একটি; কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতা যেন মজলিসে উপস্থাপিত বিষয় সমূহ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে, ফলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা বিষয়গুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:((আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এগুলো মনে রাখবে: দান করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না.....)) {তিরমিযি} লেখক রহিমাহুল্লাহ এই পথই অনুসরণ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়:

[১] ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে কি সালাফগণ ঐক্যমত?
হ্যা; এটি কুরআন - সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন ও ইমামগণের মতামত দ্বারা সাব্যস্ত।

[২] ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে কে সর্ব প্রথম কিতাব রচনা করেন?
গ্রহনযোগ্য সকল কিতাবেই এই মূলনীতি গুলি বিদ্যমান; তবে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন: শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আত্ তামীমী (রহিমাহুল্লাহ)।

[৩] কিভাবে আমরা ছয়টি মূলনীতি আয়ত্ত্ব করবো?
প্রত্যেকটি মূলনীতি ও তার বিপরীত বিষয়গুলি ভালোভাবে জানার মাধ্যমে।

প্রথম মূলনীতি:

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:
ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠতা, যিনি এক, যার কোন শরীক নেই এবং এর বিপরীত বিষয়ের বর্ণনা, আর তা হচ্ছে শিরক। কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই মূলনীতির আলোচনা এমন সহজ ভাষায় করা হয়েছে যা সাধারন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ ব্যক্তিটিও সহজে বুঝতে সক্ষম। অত:পর যখন অধিকাংশ উম্মাতের উপর যা হওয়ার তা হলো তখন শয়তান তাদের সামনে সৎকর্মশীলদের নিন্দা করা ও তাদের অধিকার হ্রাস করাকেই 'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতা হিসেবে উপস্থাপন করলো, সেই সাথে সৎকর্মশীলদের ভালোবাসা ও তাদের অনুসরন করাকে শিরক হিসেবে উপস্থাপন করলো।

আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা:

মানুষ তার ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জন ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্য করবে; অর্থাৎ

[১] তার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[২] তার ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৩] তার সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৪] তার ইবাদাতের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৫] তার ইবাদাতটি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভের জন্যই হবে।

কুরআনুল কারীমে 'ইখলাস' সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১] {আপনি বলুন নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।} [আল-আন্‌আম:১৬২]	[২] {আর তাদেরকে কেবলমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।} [আল-বায়্যিনাহ: ৫]	[৩] {তোমার পূর্বে যখনই কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রদান করেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।} {আল-আম্বিয়া: ২৫]

‘ইখলাস’ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১] একজন ব্যক্তি বললেন: ‘যদি আল্লাহ ও আপনি ইচ্ছা করেন।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করলে? বরং বলো: শুধুমাত্র আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। {আহমাদ}

[২] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করলো, সে শিরক্ বা কুফরী করলো। {আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি}

[৩] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলো, তবে লক্ষ্য রেখো যে, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা আমাকে তার থেকে বেশি মর্যাদা দাও তা আমি পছন্দ করিনা। {আহমাদ}

ইখলাসের বিপরীত হচ্ছে শিরক্:

[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। {আন-নিসা: ৪৬}

[২] তিনি বলেন: আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকটে এই নির্দেশ দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো ও তাগুত কে পরিত্যাগ করো। {আন-নাহল:৩৬}

[৩] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক্ না করে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক্ করে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। {মুসলিম}

শিরক্ দুই প্রকার:

[১] বড় শিরক্, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়: আর তা হচ্ছে ঐ শিরক্ যাকে আল্লাহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক্ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, এটা সার্বিকভাবে তাওহিদের বিপরীত। যেমন: কবরবাসীর কাছে দু’আ করা, অনুপস্থিত কারো নিকটে এমন কিছু চাওয়া যেটা উপস্থিত কেউ ব্যতিত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

[২] ছোট শিরক্, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না: আর তা হচ্ছে প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজ যাকে আল্লাহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (সরাসরি শিরক্ বলেননি), এটা সার্বিকভাবে তাওহিদের বিপরীত নয়। যেমন: আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করা, ছোট রিয়া বা লৌকিকতা।

ছোট ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য:

[১] বড় শিরক্:	[২] ছোট শিরক্:
-ইসলাম থেকে বের করে দেয়। -সকল আমল বাতিল করে দেয়। -চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -শাসক কতৃক তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ও তাকে হত্যা করা বৈধ। -সে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি ঘটনা একটি নির্দিষ্ট কারনেই ঘটে থাকে, আল্লাহর হুকুমে নয়। - এই শিরকের উপর মৃত্যু বরন করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। - দলিল দ্বারা সাব্যস্ত যে এটি একটি বড় শিরক্। - সে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর যে কোনো ঘটনা আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নির্দেশেই ঘটে থাকে, এমন কি কল্যাণ দেয়া ও অকল্যাণ প্রতিরোধের ক্ষমতাও তার হাতে।	-ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। -নির্দিষ্ট আমল বাতিল করে দেয়। -চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -শাসক কতৃক তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ও তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। -আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারন হিসাবে নির্ধারণ করেননি তাকে ঐ ঘটনার কারন হিসাবে নির্ধারণ করে। - এই শিরকের উপর মৃত্যু বরন করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কিনা এ ব্যপারে মতানৈক্য আছে। - দলিল দ্বারা সাব্যস্ত যে এটি একটি ছোট শিরক্। - বড় শিরকে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম, এমন প্রতিটি কাজই ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। - শরীয়তে যে সকল কাজকে শিরক্ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিন্তু (ال) ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়নি, সে সকল কাজ সাধারণত ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

শিরক থেকে ভয় করা:

কিছু শিরক খুবই গোপনীয়, এজন্য আল্লাহর খলীল ও একনিষ্ঠ মুসলিমদের ইমাম ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামও শিরককে খুবই ভয় পেতেন, আল্লাহ তা'য়ালা তার দু'আ উদ্বৃতি করে বলেন: (আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন) {ইবরাহীম: ৩৫}, ইবনু আবি মুলাইকা রহিমাহুল্লাহ বলেন: ((আমি ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, প্রত্যেকেই নিজের উপর নিফাকির ভয় পেতেন।)) সুতরাং মুনাফিক ব্যতিত কেউ নিফাক থেকে নিরাপদ নয়, এবং মুমিন ব্যতিত কেউ নিফাকিকে ভয় পায়না। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সম্পাদন করার মাধ্যমে শিরককে ভয় করা উচিৎ:

[১] তাওহীদ শিক্ষা করা, এর দাবী অনুযায়ী আমল করা, এর উপর মানুষকে দাওয়াত দেয়া, এর উপর ধৈর্য্য ধারন করা।	[২] শিরক্ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা , শিরক্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এর কারনগুলি জানা।	[৩] আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি দু'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা।	[৪] শিরক্ ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষনা করা, তাদের থেকে দূরে থাকা; যেন সে নিজেই তাদের একজন হয়ে না যায়।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।

এই মূলনীতিটি আল্লাহ তা'য়ালা এমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা একজন সাধারণ মানুষের ও বোধগম্য; পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় দলে দলে বিভক্ত হয়ে ধ্বংস হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি রাসূলদেরকে তাদেও উম্মাত কে দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ করার ও দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ব্যপারে সুন্নাহ তে অতি আশ্চর্যজনক ভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা এই বিষয়টিকে আরো বেশি স্পষ্ট করেছে।

অথচ পরবর্তীতে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, দ্বীনের মূল ও শাখাগত বিষয়ে বিভক্তিই ইলম ও দ্বীনের ফিকহ্ হিসেবে গন্য হতে থাকলো, এবং পাগল ও নাস্তিকরাই দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলতে থাকলো।

কুরআনুল কারীমে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১]((আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু অত:পর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।)) {আলে-ইমরান :১০৩}

[২] ((তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে।আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।)) {আলে-ইমরান: ১০৫}

[৩]((নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়;)) {আল-আনআম: ১৫৯}

[৪]((এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না ; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।))

{আল-আনফাল:৪৬}

ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১]((একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।)) {বুখারী ও মুসলিম}

[২]((তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না,গোয়েন্দাগিরি করো না, ছিদ্রান্বেষণ করো না, একে অপরকে ধোঁকায় ফেলবে না, আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকো।)) {বুখারী ও মুসলিম}

[৩]((এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই,সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে না, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না, তাক্বওয়ার স্থান এখানে, তাক্বওয়ার স্থান এখানে, -তিনি বুকের দিকে ইশারা করলেন- কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাই কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রত্যেক মুসলিমের মান-সন্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলিমের উপর হারাম।)) { বুখারী ও মুসলিম }

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজ থেকে নিষেধ করেছেন যা মানুষের মাঝে দূরত্ব ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যা মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে।

সাহাবীগণের আমল:

তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় মতানৈক্য তৈরী হয়েছে তবে এই মতানৈক্য তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করেনি, তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বা শত্রুতা সৃষ্টি করেনি, যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আহযাবের যুদ্ধে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যখন তিনি তাদের বলেন যে, ((তোমাদের কেউ যেন বানী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের সলাত আদায় না করে।)){বুখারী ও মুসলিম}, অত:পর পথিমধ্যে যখন আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হলো তখন কেউ কেউ বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার আনুগত্য করবো, আরেক দল বললেন: আমরা আসরের ওয়াক্তেই আসরের সলাত আদায় করবো, কেননা তিনি আমাদের কে এজন্যই এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন দ্রুত বের হই। এই মতানৈক্যের কারনে তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করেনি।

সালাফগণের আমল:

মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হচ্ছে: যে সকল মাসআলায় ইজতিহাদ বৈধ, সে সকল মাসআলায় যদি ইজতিহাদের কারনে মতানৈক্য হয় তাহলে একদল অপর দলের ওজর গ্রহন করে নিতেন, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতেন না।

ইসলামী শরঈয়তে ঐক্যবদ্ধতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবো।	আমরা এক নবীর অনুসরন করবো।	আমরা এক শরীয়তের উপর আমল করবো।	আমাদের ক্বিবলা এক।	আমাদের খলিফা এক।

বিভিন্ন অঞ্চল, দেশের মানুষেরা আরাফার ময়দানে একত্রিত হবে।	প্রতি ঈদে আমরা সকলে একত্রিত হবো, এমনকি পর্দার বিধান পালন সাপেক্ষে মহিলা ও বাচ্চারাও একত্রিত হবে।	শহরবাসীরা প্রতি জুমুআর সলাতে একত্রিত হবে।	প্রতিটি এলাকায় আমরা দৈনিক পাঁচবার ফরজ সলাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবো।

তৃতীয় মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

নিশ্চয় পরিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধতার স্বরূপ হচ্ছে: যিনি আমাদের উপরে শাসক হিসেবে নিযুক্ত হবেন পরিপূর্ণরূপে তার আনুগত্য করা, যদিও তিনি হাবশি গোলাম হন।

শরীয়ত ও মর্যাদা উভয়দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই মূলনীতিটি পরিপূর্ণ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরও বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যে, নিজেকে আলেম দাবী করা অধিকাংশ লোকই এই মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ, তাহলে কিভাবে এর উপর আমল করা হবে?!

নেতার আনুগত্য হবে:

[১] তার নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে।	[২] তার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

নেতার আনুগত্য আবশ্যক হওয়া বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১](হে ইমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো,এবং রাসূলের আনুগত্য করো, এবং তোমাদের শাসকদের){আন-নিসা:৫৯}	[২](তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।){আল-আনফাল:৪৬}	[৩](আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।) {আলে-ইমরান:১০৩}

নেতার আনুগত্য আবশ্যক হওয়া বিষয়ে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১] আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এই মর্মে বাইয়াত করেছি যে, আমরা আমাদের সুখে-দু:খে, আনন্দে-বেদনায় ও আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা তাঁর আনুগত্য করবো, এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সাথে বিবাদ করবো না। তিনি বলেন: তবে যদি তোমরা এমন বিষয়ে স্পষ্ট কুফরী দেখ যে বিষয়ে তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)	[২] যে ব্যক্তি তার নেতার মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমানও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)	[৩] যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলো সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। (মুসলিম)

ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষনকারী দেখতে পাবে যে:

[১] যে জাতি তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছে, দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ থেকেছে, নেতাদের সম্মান করেছে, সৎকাজে তাদের আনুগত্য করেছে, পৃথিবীতে তারাই বিজয়ী হয়েছে এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[২] আর যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য তৈরী হয়েছে, দ্বীনের ব্যপারে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে,নেতার আনুগত্য থেকে বের হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে, তখনই তাদের শত্রুদের মন থেকে তাদের ভয় দূর হয়ে গেছে, তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়েছে ফলে তারা ব্যর্থ হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা চলে গেছে, অন্যান্য জাতি তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এবং তারা স্রোতে প্রবাহমান জঞ্জালের ন্যায় জঞ্জালে পরিনত হয়েছে।

একজন অভিভাবক ও নাগরিক হিসেবে আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে:

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপরে যে তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজের প্রতি ভালোবাসা, সহযোগীতা ও ঐক্যবদ্ধতা ওয়াজীব করেছেন আমরা তা পালন করবো, হক্বের উপর একতাবদ্ধ থাকবো, পরস্পরকে সহযোগীতা করবো, সকল কাজ ইখলাসের সাথে করবো, আমরা সকলেই একই উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কাজ করবো আর তা হচ্ছে এই উম্মাতের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সংশোধন, আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো এবং আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিভেদ পরিত্যাগ করবো।

চতুর্থ মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

ইলম ও আলেমগণের বর্ণনা, ফিকহ্ ও ফকিহগণের বর্ণনা, এবং যারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পরও তাদের অন্তর্ভূক্ত নয় তাদের বর্ণনা।

এই মূলনীতিটি আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারাহ এর শুরুতে (হে বানী ইসরাইলগণ! তোমরা আমার সেই নেয়ামাতের কথা স্বরণ করো যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছিলাম) {আয়াত:৪০} এখান থেকে (হে বানী ইসরাইলগণ!){আয়াত: ১২২} এই পর্যন্ত এর ভিতরে আলোচনা করেছেন।

সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্য সুন্নাহ তে মূলনীতিটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এটি আরো বেশি স্পষ্ট হয়।

অথচ পরবর্তীতে এটি সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয়ে পরিনত হয়েছে! ইলম ও ফিকহ্ হয়ে গেছে বিদআত ও পথভ্রষ্টতা, এবং হক্ব কে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ করাটাই তাদের নিকটে পছন্দনীয় হয়ে গেছে! আর আল্লাহ তা'য়ালা যেই ইলম অর্জন করা ফরজ করেছেন ও যেই ইলমের প্রশংসা করেছেন সেই ইলমের কথা নাস্তিক ও পাগল ব্যতিত কেউ উচ্চারন করে না! আর যারা এই ইলমের বিরোধিতা করেছে, এর সাথে শত্রুতা করেছে, এর থেকে ভীতিপ্রদর্শন করেছে, এটি অর্জন করতে নিষেধ করেছে, তারা হয়ে গেছে ফকীহ্, আলেম!

ইলম দুই প্রকার:

[১] শরীয়ত ও তারসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা:	[২] দুনিয়াবী শিক্ষা: যেমন:চিকিৎসা বিদ্যা,প্রকৌশল বিদ্যা, ইত্যাদি, এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:		
আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের উপর যে সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত অবতীর্ণ করেছেন সে সম্পর্কিত ইলম কে শরয়ী ইলম বলা হয়। এই প্রকারের ইলম সার্বিকভাবে প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর, কুরআন ও সুন্নাহ তে বর্ণিত ইলম দ্বারা মুলত: এই প্রকারের ইলমই উদ্দেশ্য।	[ক] এই প্রকারের ইলম যদি কল্যাণের মাধ্যম হয় তাহলে তা অর্জন কল্যাণকর।	[খ] এই প্রকারের ইলম যদি অকল্যাণের মাধ্যম হয় তাহলে তা অর্জন অকল্যাণকর।	[গ] এই প্রকারের ইলম যদি কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুরই মাধ্যম না হয় তাহলে তা অর্জন অনর্থক ও সময়ের অপচয় ব্যতিত কিছু নয়।

ইলমের প্রশংসায় বর্ণিত কতিপয় আয়াত ও হাদিস:

[১] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: (বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে) {আয-যুমার:৯}

[২] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: নিশ্চয় নবীগণ কাউকে দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না, তারা কেবলমাত্র ইলমের উত্তরাধিকারী করেন, সুতরাং যে এটা অর্জন করলো সে পূর্ণ অংশই অর্জন করলো। (আহমাদ)

[৩] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ যার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম

ইলমের কতিপয় ফযিলাত:

[১] নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে তাঁর বান্দাদের মাঝে আলেমদের মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী বৃদ্ধি করেন, এবং পরকালে জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

[২] এটি এমন একটি ইবাদাত যার প্রতিদান মৃত্যুর পরও চলমান থাকে;(মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতিত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়: সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকার লাভ হয়,.....){মুসলিম}

[৩]এ ব্যাপারে হিংসা করা বৈধ; (দুই ধরনের ব্যক্তির সাথে হিংসা বৈধ: ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন এবং সে এই সম্পদ হক্বের পথে খরচ করে, আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান দান করেছেন এবং সে এই জ্ঞান দ্বারা ফায়সালা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দান করে।) {বুখারী ও মুসলিম}

[৪] এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ, কেননা তিনি বলেন: ((নিশ্চয় তারা ইলমের উত্তরাধিকার বানান))

[৫] এটি এমন আলো যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়; সে জানতে পারে কিভাবে সে তার রবের ইবাদাত করবে, কিভাবে অন্যের সাথে আচরণ করবে।

[৬] নিশ্চয় আলেম ব্যক্তি আলোর ন্যায়, যার দ্বারা মানুষ তাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে:

প্রকৃত আলেম চেনা, তারা এমন আল্লাহ ওয়ালা যারা মানুষদেরকে তাদের রবের শরীয়ত শিক্ষা দিয়ে থাকে।

পঞ্চম মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা কতৃক তাঁর ওলীদের বর্ণনা এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহর শত্রু মুনাফিক ও পাপীদের মধ্য হতে যারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের মধ্যকার পার্থক্যের বর্ণনা।

এ মূলনীতিটি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নিম্নের কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট।

সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াত ((আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরন করো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কে ভালোবাসবেন)){আয়াত:৩১}

সূরা মায়েদাহ এর একটি আয়াত ((হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে;)) {আয়াত:৫৪}

সূরা ইউনুস এর দুটি আয়াত ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {আয়াত: ৬২,৬৩}

বিষয়টি এত স্পষ্ট হওয়ার পরও শরীয়তের হিফাজতকারী, সৃষ্টিজীবের পথ প্রদর্শনকারী ও ইলমের দাবীদ্বার অধিকাংশ লোকদের নিকটে বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যে, ওলী হওয়ার জন্য রাসূলের অনুসরন পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে তাঁর অনুসরন করবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! তাদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে জিহাদ করবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! তাদের কে ইমান ও তাক্বওয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে ইমান ও তাক্বওয়ার উপরে চলবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের দু'আ শোনেন।

কিভাবে আমরা আল্লাহর ওলীদের চিনবো:

যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে, তাঁকে ভয় করেছে, তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল থেকেছে তারাই আল্লাহর ওলী; আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

নিজেকে আল্লাহর ওলী হিসেবে দাবী করার অর্থ হলো নিজের প্রশংসা করা, এটা তাক্বওয়ার পরিপন্থি।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ((অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক অবগত তার সম্পর্কে যে তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।)){আন-নাজম:৩২}

লেখক রহিমাহুল্লাহ তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন:

[১]((যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরন করো, তিনি তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)) {আলে-ইমরান:৩১}

এই আয়াতকে 'আয়াতুল মিহনা' বা যাচাই-বাছাইয়ের আয়াত বলা হয়। হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে লোকেরা বলতো:হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের পরাক্রমশালী প্রতিপালককে খুবই ভালোবাসি। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ভালোবাসার একটি মানদন্ড স্থাপন করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, অত:পর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

[২] ((হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে;)) {আল-মায়েদাহ:৫৪}

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের গুন বর্ণনা করেছেন যে, তারা হবে:

[১] মুমিনদের প্রতি কোমল, ফলে তাদের সাথে লড়াই করবে না, তাদের প্রতিপক্ষ হবে না, তাদের বিরোধিতা করবে না।

[২] কাফেরদের উপর কঠোর, অর্থাৎ তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করবে ও প্রভাব বিস্তার করবে।

[৩] আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করবে।

[৪] আল্লাহর রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।

[৩] : ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর ওলীগণ তারাই যারা তাদের অন্তরে ইমানকে ধারন করেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ তে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাঁর কিছু ওলী রয়েছে, এবং শয়তানেরও কিছু ওলী রয়েছে। অত:পর তিনি রহমানের ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন:

[১] আল্লাহর ওলী:

তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন: ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

[২] শয়তানের ওলী:

তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন: ((নিশ্চয়ই তার আধিপত্য (অর্থাৎ শয়তানের) তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে, এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।)) {আন-নাহল:১০০}

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

একাধিক বিদ্বানগণ বলেন যে, (যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে হাওয়ায় উড়তে দেখো এবং পানির উপরে হাটতে দেখো, তাহলে যেন তোমরা তার দ্বারা ধোঁকায় পতিত হয়ো না বরং শরীয়তের নির্দেশিত বিষয় পালনে ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকার ব্যপারে তার অবস্থান লক্ষ্য করো।)

আল্লাহর ওলীগণ দুই স্তরের:

[১] অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত	[২] ডান দিকের দল-মধ্যমপন্থী

উভয় দলের ব্যপারে আল্লাহ তা'য়ালা তার মহা গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে আলোচনা করেছেন: সূরা ওয়াক্বিয়াহ এর শুরুতে ও শেষে, সূরা ইনসান (দাহর) এ, সূরা মুতফ্ফিফিনে, সূরা ফাতিরে। জান্নাতের অনেকগুলি স্তর রয়েছে, এই স্তরগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠত্যের বড় পার্থক্য বিদ্যমান, আল্লাহর মুমিন-মুত্তাক্বী ওলীগণ তাদের ইমান ও তাক্বওয়া অনুযায়ী এই স্তর সমূহে অবস্থান করবেন।

আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] সীমালংঘনকারী: এই প্রকারের ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী হিসেবে বিশ্বাস করে: সে ধারনা করে যে আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতেই সমস্ত কাজ করে থাকেন, সকল কাজ তার উপরই সোপর্দ করে।	[২] অবহেলাকারী: যখন সে আল্লাহর ওলীকে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ করতে বা কথা বলতে দেখে, তখন তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওলীদের থেকে বের করে দেয়, যদিও সে একজন ভুলকারী মুজতাহিদ হয়ে থাকে না কেনো!	[৩] মধ্যমপন্থী: যারা আল্লাহর ওলীদের নিষ্পাপও মনে করে না, আবার যদি তিনি ভুলকারী মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে পাপীও মনে করে না, এজন্য এরা সকল বিষয়ে তার অনুসরন করে না এবং যদি তিনি ইজতিহাদ করে কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেন তাহলেও তার উপর কাফের বা ফাসেক হুকুম আরোপ করে না।

আল্লাহর ওলীগণের কারামত:

[১] প্রমাণিত: তাদের কারামত বিদ্যমান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুত্তাক্বী ওলীগণকে সন্মানিত করেন। আল্লাহর ওলীগণকে কারামত দেয়া হয় দ্বীনের হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অথবা মুসলিমদের প্রয়োজন অনুসারে।

[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শন: কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরনের দ্বারাই মূলত: কারামত অর্জিত হয়, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর নিদর্শন সমূহেরই অন্তর্ভূক্ত।

[৩] আল্লাহর ওলীদের জন্য কারামত আবশ্যক নয়: কারামতগুলি সাধারনত: ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ে থাকে, সুতরাং যখন ইমানের দুর্বলতার কারনে কারামত প্রয়োজন হয় তখন তাকে এমন কারামত দেয়া হয় যার দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয় এবং প্রয়োজন পূরণ হয়। অপরদিকে আল্লাহর পরিপূর্ণ ওলীদের জন্য কারামতের প্রয়োজন হয় না, ফলে তিনি তাদের কারামত প্রদান করেন না, এই কারনে কারামতের বিষয়টি সাহাবীদের থেকে তাবেঈদের মাঝে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অলৌকিক অভ্যাসসমূহ:

আর তা হচ্ছে এমন কোন কাজ করা যা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থি; যেমন: বাতাসে উড়ে বেড়ানো, পানির উপরে হাটা, ইত্যাদি। এগুলি চার প্রকার:

[১] আয়াত বা নিদর্শন: যা নবীদের জন্য হয়ে থাকে, এটাকে মু'জিযা বলা হয় না; কেননা কুরআনে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, আর মু'জিযা কিছু মানুষ করতে অপারগ হয় ঠিকই তবে এটি নবীগণ ব্যতিত অন্যদের দ্বারাও হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে কেউ আয়াত বা নিদর্শনের দাবী করতে পারে না।

[২] কারামত: এটি আল্লাহর ওলীদের জন্য হয়ে থাকে; যারা নিজেদের মাঝে ইমান ও তাক্বওয়া এর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি কারামতের একটি উদাহরন।

[৩] মু'জিযা বা ফিতনা: যেটা শয়তানের ওলীদের জন্য হয়ে থাকে, ব্যক্তির অবস্থা দেখেই আমরা এটি চিনতে পারবো, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাঝে ইমান ও তাক্বওয়া থাকবে না, দাজ্জালের ফিতনা এই প্রকারের একটি উদাহরন।

[৪] লজ্জা জনক কাজ (লাঞ্ছনা): যারাই আল্লাহ তা'য়ালার উপর মিথ্যারোপ করে, কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, এই প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, সে একজন অসুস্থ ব্যক্তির চোখে ফুঁ দেয়ায় তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

“অলৌকিক অভ্যাস” বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বা অবিশ্বাসকারী: এরা নাবীগণ ব্যতিত অন্যদের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাস করেন না, যদিও সামগ্রিকভাবে এর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেও তাদের মাঝে ওলী না থাকায় তারা এটিকে অস্বীকার করেন।	[২] সীমালঙ্ঘনকারী: এই প্রকারের ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে, অলৌকিক অভ্যাসে সক্ষম সকল ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী।	[৩] মধ্যমপন্থী: এই প্রকারের ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকে অলৌকিক অভ্যাসের আকৃতিতে যে কোন কারামত প্রদান করেন, তবে সকল অলৌকিক অভ্যাসই কারামত নয়, বরং যাদু ও প্রতারনার মাধ্যমেও অনেক অলৌকিক কর্মকান্ড হয়ে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রচিত “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم” গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পার্থক্য:

আল্লাহর ওলী:	শয়তানের ওলী:
- কুরআন ও সুন্নাহ এর অনুসরন করে। - তাক্বওয়া ও ইমানের গুনে গুণান্বিত। (মানুষ ধাতুর ন্যায়, তাদের মাঝে পার্থক্য হয় তাক্বওয়ার দ্বারা।) - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরন করে, তাঁর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যায় না। - মানুষকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরন, ফরজ আদায় ও দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করে। - বিশ্বাস করে যে, নাবীগণ ওলীদের থেকে উত্তম, এবং ওলীগণ সামগ্রিকভাবে নিস্পাপ নন। - তাদের কারামত লাভের কারনই হচ্ছে ইমান ও তাক্বওয়া।(কর্মের প্রতিদান) - আল্লাহর জন্য তাদের কে ভালোবাসা ও তাদের সমর্থন করা বা তাদের বন্ধু হওয়া উচিৎ।	- কুরআন ও সুন্নাহ এর বিরোধিতা করে। - কুফরী, পাপাচার, ভাগ্য গণনা, যাদু, পাগলামী, কাশফ ইত্যাদি দোষে দুষ্ট। - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তাঁর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যায়। - মানুষকে তাদের অনুসরনের প্রতি আহবান করে, ফরজ আদায় ও দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করে না। - বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ নবীগণ থেকে উত্তম, এবং ওলীগণ সামগ্রিকভাবে নিস্পাপ ও তারা ইজমার বিরোধিতা করতে পারে। - তারা মু'জিযা অথবা ফিতনা অথবা লাঞ্ছনা লাভ করে, কাফের বা মুনাফিকের জন্য ওলী হওয়া সম্ভব নয়, এবং কাফেরদের প্রশংসা করাও উচিৎ নয়।

আল্লাহর ওলী:	শয়তানের ওলী:
- নেফাক থেকে ভয় পায়, তাদের অবস্থা দিয়ে কাউকে ধোঁকা দেয় না। - অন্যান্য মানুষের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করে না, বরং তাদের মাঝে সুন্নাতের প্রকাশ ঘটে। - তাদের মাঝে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা নেই। - তারা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় দিক দিয়েই ইমানের গুনে গুণান্বিত। - যে ব্যক্তি ধারনা করে যে, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কেই অবগত, গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত নন; সে কাফের। - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো কোন ওলী নেই। - পাপ কাজে লিপ্ত থাকে না, আর এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসার একটি আলামত। - বিপদে পতিত হলে সেটাকে তাক্বদীর ও আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে মেনে নেয়, তবে কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে তাক্বদীর বা আল্লাহর ফায়সালা কে যুক্তি হিসেবে পেশ করে না। - তাদের জন্য ইবাদাতের জায়গা হচ্ছে মাসজিদ। - তাদের নিকটে কারামতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকা।	- আল্লাহর জন্য তাদের কে ঘৃণা করা উচিৎ। - নেফাক থেকে ভয় পায় না, তাদের অবস্থা দিয়ে অন্যদের ধোঁকা দেয় । - অন্যান্য মানুষের মাঝে পোশাক, চুল মুণ্ডন ইত্যাদি দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। - তাদের মাঝে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা আছে। - তাদের প্রকাশ্য ও গোপন ইমানের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। - তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। - তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, নাবীগণ ও ওলীগণ একই স্তরের। - শয়তান তাদের মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে, ফলে তারা শয়তানকে ফিরিশতা মনে করে। - আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীগণ 'ক্বাদারীয়্যাহ', ও পাপকাজে সীমালঙ্ঘনকারীগণ 'জাবারীয়্যাহ'। -তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ নাবুওয়াত ও ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত। - তারা 'হুলুল' ও 'অহদাতুল উজুদ' আক্বীদায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুর ভিতরে ও সকল স্থানে আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্যমান। - তারা কবর কে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে। - তারা এমন কাজ করে যার দ্বারা শয়তানি চরিত্র শক্তিশালী হয়, যেমন: গান বাজনা, শীস দেয়া, হাততালি দেয়া ইত্যাদি।

ষষ্ঠ মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

কুরআন ও সুন্নাহ কে ত্যাগ করা এবং বিচ্ছিন্ন-ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও মতাদর্শের অনুসরন করার উপরে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তান যে সকল সন্দেহ সৃষ্টি করে সেগুলিকে খণ্ডন করা; আর সে সন্দেহ গুলি হচ্ছে:'মুজতাহিদ মুতলাক্ব ব্যতিত কেউ কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে পারে না'; আর মুজতাহিদ হচ্ছে যিনি এই এই গুণে গুণান্বিত!

এমন সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় যেগুলি সম্ভবত আবু বকর ও ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর মধ্যেও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাবে না!! সুতরাং কোন মানুষ যদি এই পর্যায়ের না হয় তাহলে তার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি বুঝ গ্রহণ না করা আবশ্যক, এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই; আর এই অবস্থায় যে এখান থেকে হেদায়াত অনুসন্ধান করে সে হয়তো নাস্তিক নয়তো পাগল, কেননা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা অত্যন্ত কঠিন!!

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি: অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শারঈ, তাক্বদিরী, সৃষ্টিগত ও আদেশগত সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবে এই অভিশপ্ত সন্দেহটিকে এমন স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন, যা মেনে নেয়া একটি সার্বজনীন প্রয়োজনের পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে:(কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না){আল-আ'রাফ: ১৮৭}, (অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর সে বাণী অবধারিত হয়েছে; কাজেই তারা ঈমান আনবে না* নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি,ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে* আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না* আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ইমান আনবে না* আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিকর' এর অনুসরন করে এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। আতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরষ্কারের সুসংবাদ দিন।){ ইয়াসিন:৭-১১}

ইজতিহাদ:

[১] শাব্দিক অর্থ:	[২] পারিভাষিক অর্থ:
কঠিন কোন কিছু অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা।	শরীয়তের কোন বিষয়ের হুকুম অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

ইজতিহাদের কতিপয় শর্ত:

[১] মুজতাহিদকে তার ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শারঈ দলিল সমূহ জানা থাকতে হবে; যেমন: বিভিন্ন হুকুম সংবলিত আয়াত ও হাদিস।	[২] হাদিস সহিহ বা যঈফ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে; যেমন সনদ , রিজাল শাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।	[৩] নাসেখ, মানসুখ, ইজমা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে হবে, যেন এমন হুকুম না দেয় যা মানসুখ হয়ে গেছে বা ইজমার বিপরিত হুকুম না দেয়।	[৪] ঐ সমস্ত দলিল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যার কারনে হুকুমের ভিতরে বৈপরীত্য আসতে পারে, যেমন: তাখসীস-তাক্বইইদ ইত্যাদি, যেন সে এর বিপরীত কোন হুকুম না দেয়।	[৫] ভাষা ও উসুলে ফিকহের মধ্যে দালালাতুল আলফায্ (বিভিন্ন শব্দের নির্দেশনা) এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে; যেমন: আম-খাস ইত্যাদি, যেন এর চাহিদা অনুযায়ী হুকুম প্রদান করতে পারে।	[৬] তার মাঝে এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যার দ্বারা সে বিভিন্ন দলিল-আদিল্লাহ থেকে হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়।

ইজতিহাদ কি আংশিক হতে পারে?

হ্যা, হতে পারে, কোন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে ইজতিহাদ হতে পারে, আবার কোন একটি নির্দিষ্ট মাসয়ালার ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ হতে পারে।

মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা, অত:পর যদি:

[১] হুকুম স্পষ্ট হয় , তাহলে সেই হুকুম প্রদান করবে; অত:পর যদি:

[ক] হুকুমটি সঠিক হয় তাহলে তার জন্য দুটি সাওয়াব: ইজতিহাদের সাওয়াব ও সঠিক হুকুমে উপনিত হওয়ার সাওয়াব, কেননা হক্বে উপনিত হওয়ার দ্বারা হক্বকে প্রকাশ করা ও তার উপর আমল করা সম্ভব হয়।

[খ] আর যদি হুকুমটি ভুল হয়, তাহলে তার জন্য একটি সাওয়াব এবং তার ভুলটি ক্ষমা করা হবে।

[২] আর যদি তার নিকটে কোন হুকুমই স্পষ্ট না হয় : তাহলে তার জন্য এ বিষয়ে হুকুম দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, এমতাবস্থায় প্রয়োজনে তাক্বলিদ করা বৈধ।

দুই ক্ষেত্রে তাক্বলিদ বৈধ:

[১] মুক্বাল্লিদ যদি একজন সাধারন ব্যক্তি হন, যিনি নিজে নিজে হুকুম জানতে সক্ষম নন: তার জন্য তাক্বলীদ করা আবশ্যক; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:(যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।){আন-নাহল:৪৩}

[২] মুজতাহিদ ব্যক্তির সামনে এমন কোন নতুন বিষয় উপস্তিত হলো যে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানো প্রয়োজন, ইজতিহাদ করার মতো প্রয়োজনীয় সময় নেই; এমতাবস্থায় তার জন্য তাক্বলীদ বৈধ।

তাক্বলিদ দুই প্রকার:

[১] আম:
নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে ধারন করবে, দ্বীনের সকল বিষয়ে উক্ত মাযহাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এ বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন এটি হারাম; কেননা এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত অন্য কাউকে সার্বিকভাবে মেনে চলা বাধ্য হয়ে যায়।

[২] খাস:
নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কারো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; যখন হক্ব জানতে অপারগ হবে তখন এই ধরনের তাক্বলীদ বৈধ, চাই:

[ক] প্রকৃতই অপারগ হোক।

[খ] অথবা অনেক কষ্ট সাপেক্ষে সেটি করতে সক্ষম হোক।

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, কিয়ামাত পর্যন্ত দরূদ ও অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আমরা আল্লাহর নিকটে দু'আ করি তিনি যেন লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করেন, তিনি যেন তাঁকে এবং আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করেন, নিশ্চয় তিনি দানশীল ও দাতা, সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য,দরূদ ও অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

পরীক্ষা

নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

কেন আমরা উসুলুস সিত্তাহ বা ছয়টি মূলনীতি পড়বো?	[১] ..... [২] .....
ছয়টি মূলনীতি ও তার বিপরীত বিষয়সমূহ উল্লেখ করো:	[১] ..... [২] ..... [৩] ..... [৪] ..... [৫] ..... [৬] .....

আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করো	[১] ..... [২] ..... [৩] ..... [৪] ..... [৫] .....

[২] সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে: ☐ সকলে ঐক্যমত ☐ এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে
কুরআন ও সুন্নাহতে যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে: ☐তার মাফহুম আছে ☐তার মাফহুম নেই ☐ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ
দলিল ও বুঝের মূল : ☐ তিনটি ☐ চারটি ☐ পাঁচটি

[৩] 'সঠিক' অথবা 'ভুল' নির্ধারনের মাধ্যমে উত্তর দাও:

প্রশ্ন	সঠিক	ভুল
কখনো কখনো সংখ্যা উল্লেখ থাকে তবে নির্দিষ্টভাবে ঐ সংখ্যাই বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; যেমন: জান্নাতের দরজাসমূহ	☐	☐
কখনো কখনো সংখ্যা উল্লেখ থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঐ সংখ্যাই বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; যেমন: জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন	☐	☐
মজলিসে কোন সংখ্যা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মাসআলাটি সঠিকভাবে আয়ত্ব করা ও যথাযথরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়া	☐	☐
মাসআলাগুলি গণনা করে একত্রিত করায় আল্লাহ তা'য়ালা লেখককে কল্যাণ দান করুন	☐	☐

[৪] নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে যে সংখ্যাটি নির্দিষ্ট বুঝানো উদ্দেশ্য তার পাশে গোল চিহ্ন দাও:

ইমানের রুকনসমূহ	তিনটি মূলনীতি	সাতটি ধ্বংসাত্বক বিষয়	(পাঁচটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত)
পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করা	অচিরেই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে	মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ আছে যার দ্বারা সে কুফরী করে	ফরজ সলাতের পর পঠিতব্য দু'আ সমূহ

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্য হতে কোনটির সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য এবং কোনটির সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য নয় তা বর্ণনা করো:

চারটি কায়েদা	তিনটি মূলনীতি	ইসলাম ভঙ্গের দশটি কারন	ছয়টি মূলনীতি
.....	.....	.....	.....